সমকাল
প্রথম
ভারত সবার আগে
কলকাতা
খবরে প্রথম
SOMOYER PROTHOM KOLKATA
Prothom Kolkata (www.somoyerprothomkolkata.com)

প্রথম কলকাতা খবরে প্রথম
আপনার প্রচারের বিজ্ঞাপন দিন
৩.৭ মিলিয়ন ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ
যোগাযোগ করুন 9830317116
প্রথম কলকাতা খবরে প্রথম
ফেসবুকে ৩.৭ মিলিয়ন
ইউটিউবে ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ

Volume - I Issue - 7 ■ PRGI No.: WBBEN/26/A4351 ■ North 24 Parganas ■ 1 September 2026 ■ Price Rs. 5/-



একশোয় কত পেল বিজেপি সরকার?

মাত্র ১০০ দিনে কোনও সরকারের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয় না। তবে শুরুটা দেখে বোঝা যায়, সরকার কোন পথে হাঁটতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে ১৭ আগস্ট। তার পরেও কেটে গিয়েছে প্রায় দু'সপ্তাহ। এই সময়ের সরকারি সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক বিতর্ক এবং মানুষের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে; একশোয় কত পেল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার?

নিজেদের কাজের হিসাব দিতে ৪১ পাতার পুস্তিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। নাম- 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংকল্প ও ১০০ দিনের সাফল্য'। দল জানিয়েছে, এই রিপোর্ট কার্ড চার

সুব্রত আচার্য

কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাঁদের মতামতও নেওয়া হবে।

কিন্তু সরকারের দেওয়া হিসাবের বাইরে মানুষ কী ভাবছেন? কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলার সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক ও নানা পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম কলকাতা। তাঁদের বড় অংশই এখনই নম্বর দিতে রাজি নন। কেউ বলেছেন, ১০০ দিন কোনও সরকারকে মাপার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সরকারকে আরও সময় দেওয়া উচিত। আবার কারও বক্তব্য, সরকারের অভিমুখ ভাল। তবে কয়েকটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসন এখনও ঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

অন্য একটি অংশ প্রথম ১০০ দিনে খুব খুশি নন। তাঁদের যুক্তি, বিজেপি বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। ফলে প্রাপ্তির হিসাবও বড় হবে; এটাই স্বাভাবিক। কয়েকটি ঘটনায় তাই মন খারাপ হলেও তাঁরা এখনই চূড়ান্ত রায় দিতে চান না।

সরকারের সাফল্যের তালিকায় রয়েছে আয়ুষ্মান ভারত চালু, সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য জমি দেওয়া, সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বৃদ্ধি, বন্ধ চটকল খোলা এবং রাইটার্স বিল্ডিং সংস্কারের উদ্যোগ। সরকারের দেওয়া হিসাব

তিন পাতায়

নেপালে জল নামতেই কঠিন প্রশ্ন

বিভাস দে

বিপদের আগাম খবর কি নেপালের কাছে পৌঁছেছিল? পৌঁছলে মানুষকে সরানো গেল না কেন? নিখোঁজদের সরকারি তালিকা বারবার বদলাচ্ছে কেন? বিদেশি উদ্ধারকারী দলকে অবাধে কাজ করতে দেওয়া হল না কেন? আর যাঁদের কোনও খোঁজ মিলবে না, তাঁদের পরিবারের ভবিষ্যৎ কী হবে?

নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের ছ'দিন পরে উদ্ধারকাজের পাশাপাশি এই প্রশ্নগুলিই এখন বড় হয়ে উঠছে। কারণ জল নেমে গেলেও বিপর্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব এখনও সামনে আসেনি।

নেপালের জাতীয় দুর্যোগ কর্তৃপক্ষের ৩০ আগস্ট সন্ধ্যার হিসাব উদ্ধৃত করে এনডিটিভি জানিয়েছে, শুধু নেপালেই ৭৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ ২,৫০২ জন, তাঁদের মধ্যে ৫৯২ জন বিদেশি। তিব্বতে আরও ১৬ জনের মৃত্যু এবং ৫৪৬ জন নিখোঁজ বলে চিনের প্রশাসনের দাবি। পরের কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা আরও বেশি দেখানো হয়েছে। দুর্গম এলাকা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং একই ব্যক্তির নাম একাধিক তালিকায় থাকার কারণে কোনও সংখ্যাই এখনও চূড়ান্ত নয়।

প্রায় ২০ হাজার নিরাপত্তাকর্মী উদ্ধার অভিযানে রয়েছেন। হেলিকপ্টার, ড্রোন এবং বিশেষ দল ব্যবহার করা হচ্ছে। ৯,৪০০ জনের বেশি মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। আপার ত্রিশূলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদের খোঁজ চলছে। কিন্তু নতুন ধস, ভাঙা রাস্তা এবং নদীর জলবৃদ্ধি বারবার অভিযান থামিয়ে দিচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে আগাম সতর্কতা নিয়ে। নেপাল,তিব্বত সীমান্তের কাছে হিমবাহ ও

তিন পাতায়



'এক দেশ, এক ভোট' বিজেপির কৌশলী অভিযান

রাজনৈতিক প্রতিবেদক, দিল্লি ঃ 'এক দেশ, এক ভোট' কার্যকর করতে শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সংবিধান সংশোধন এবং সংসদে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএর হাতে এককভাবে সেই সংখ্যা নেই। তাই ভোটাভুটির আগে সংসদের ভিতরে ও বাইরে সমর্থনের জমি তৈরির কৌশল নিয়েছে শাসক দল।

লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন একসঙ্গে করার লক্ষ্যে সংবিধান (১২৯তম সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ লোকসভায় পেশ হয়েছিল ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে। বিরোধীদের আপত্তির পরে বিল দু'টি বিজেপি সাংসদ পি পি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়।

এনডিটিভি জানিয়েছে, কমিটির মেয়াদ বাড়িয়ে বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক দল, আইনজ্ঞ, নাগরিক সমাজ ও অন্য অংশীজনের মত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টিকে শুধু বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে না দেখিয়ে নির্বাচনী সংস্কার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই দলের প্রথম কৌশল।



টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখেছে, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই এই ব্যবস্থা কার্যকর করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে যৌথ কমিটি। তবে সব রাজ্যের ভোট একসঙ্গে হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বাস্তবে ২০৩৪ সালের আগে সম্ভব না-ও হতে পারে। কারণ ২০২৯ সালের পরে নির্বাচিত কয়েকটি বিধানসভার মেয়াদ কমিয়ে ২০৩৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে মেলাতে হতে পারে। কমিটির চেয়ারম্যান পি পি চৌধুরীর দাবি, দশটি রাজ্যে মতবিনিময়ের সময় প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষ একসঙ্গে নির্বাচনের পক্ষে মত

তিন পাতায়

নিরাপত্তার তালা বাংলাদেশিরা থাকবেন কোথায়?

বিশ্বজিৎ দাস

হাতে বড় ট্রলি-ব্যাগ। সঙ্গে চিকিৎসার কাগজপত্র। কখনও নিউ মার্কেট, কখনও মুকুন্দপুর। এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে ঘুরছেন বাংলাদেশি পর্যটকেরা।

প্রশ্ন একটাই, কম খরচে নিরাপদে থাকবেন কোথায়?

মির্জা গালিব স্ট্রিটের শিখা ইন-এ আগুনে সাত বাংলাদেশি-সহ ন'জনের মৃত্যুর পর বদলে গিয়েছে কলকাতার হোটেলপাড়ার ছবি। পুরসভা, দমকল ও পুলিশ এখন হোটেল এবং অতিথিশালাগুলির লাইসেন্স, অনুমোদিত নকশা ও অগ্নিনিরাপত্তার নথি পরীক্ষা করছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, অভিযানের প্রথম ছ'দিনেই প্রায় ২০০টি হোটেল ও অতিথিশালাকে বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেরাই ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। ৩১ আগস্ট প্রকাশিত তদন্ত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিখা ইন-এর বৈধ অগ্নিনিরাপত্তা শংসাপত্র ছিল না। দ্বিতীয় তলায় জরুরি নির্গমন পথ এবং কার্যকর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও পাওয়া যায়নি বলে এফআইআরে উল্লেখ রয়েছে।

প্রশাসনের অবস্থান পরিষ্কার; আগে নিরাপত্তা, পরে ব্যবসা। আগুন লাগলে যে হোটেল থেকে বেরোনোর বিকল্প পথ নেই, সেখানে পর্যটক রাখা যায় না। এই কঠোরতা প্রয়োজনীয়।

কিন্তু তালা দেওয়ার পরের প্রশ্নটির উত্তর এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথম কলকাতার সরেজমিন প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, হঠাৎ হোটেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু বাংলাদেশি পর্যটক থাকার জায়গা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ নিউ মার্কেট ছেড়ে মুকুন্দপুরে গিয়েছেন। কেউ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একাধিকবার হোটেল বদলেছেন। অনেকে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখেই নির্ধারিত সময়ের আগে বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন।

নিউ মার্কেটের সুবিধা শুধু কম ভাড়া নয়। কাছেই খাবারের দোকান, মানি এক্সচেঞ্জ, পরিবহণ এবং বাংলাদেশগামী বাসের কাউন্টার রয়েছে। মুকুন্দপুরে হাসপাতাল কাছে হলেও সেখানকার একাধিক অতিথিশালাও এখন প্রশাসনের নজরে। ফলে শুধু এলাকা বদলালেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মিলছে না।

তিন পাতায়



যাদবপুরে যত কাণ্ড!

সোমা মাইতি

একটি ছাত্রসভা ঘিরে সংঘর্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক প্রতীকের ক্ষতি। তার পরে মিছিল, পাল্টা মিছিল, পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙা, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি এবং রাতারাতি দেওয়াল মুছে ফেলা। কয়েক দিনের মধ্যে একের পর এক ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আবার রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রে।

১৯ আগস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র সংসদ ফেটসুর সাধারণ সভা চলাকালীন



এবিভিপি এবং বামপন্থী ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। আহত হন কয়েকজন। ভাঙচুর হয় অরবিন্দ ভবনে। চার নম্বর গেটে নন্দলাল বসুর নকশা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের একাংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় এবং তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি প্রত্যক্ষদর্শীদের

তিন পাতায়

সংঘর্ষ থেকে প্রতীক ভাঙা, 'জাতীয়তাবাদ' থেকে দেওয়াল মুছে ফেলা; ক্যাম্পাস ঘিরে রাজনীতির নতুন লড়াই

সম্পাদকীয়

আমাদের বাংলাদেশ নীতি কী?

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এখন ভারতের বিদেশনীতির কঠিন পরীক্ষা। এই সম্পর্ক কি কোনও দল বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে চলবে? না কি বাংলাদেশের রাষ্ট্র, জনগণ এবং ভারতের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থকে সামনে রেখে নতুন পথ তৈরি হবে? দিল্লিকে এখনই উত্তর খুঁজতে হবে।

শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনকালে দিল্লি,ঢাকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সীমান্ত নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, বাণিজ্য এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সম্পর্কের একটি বড় দুর্বলতাও ছিল। বাংলাদেশের মানুষের একাংশের কাছে ভারত ও শেখ হাসিনার সরকার প্রায় একই বন্ধনীতে ঢুকে যায়। একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ধীরে ধীরে একটি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বলে মনে হতে থাকে। কূটনীতির এই ভুল এখন ভারতের সামনে কঠিন বাস্তবতা হয়ে ফিরেছে।

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান, শেখ হাসিনার পতন, মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার এবং পরে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় আসা;বাংলাদেশের রাজনীতি আমূল বদলে দিয়েছে। বদলায়নি ভূগোল। চার হাজার কিলোমিটারের বেশি সীমান্ত, অভিন্ন নদী, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ভাষা, সংস্কৃতি এবং পারিবারিক যোগাযোগ আগের জায়গাতেই রয়েছে।

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী বক্তব্য, ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার বাড়তি ঘনিষ্ঠতাও দিল্লিকে সতর্ক রাখবে। পাকিস্তান ভারতের কৌশলগত বন্ধু নয়। বাংলাদেশের মাটিকে ভারতবিরোধী শক্তির কাজে ব্যবহার করতে দেওয়াও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তবে সতর্কতার অর্থ বৈরিতা নয়। বাংলাদেশ ভারতের বন্ধু না হলেও তাকে জোর করে শত্রু বানিয়ে লাভ নেই। তাতে পাকিস্তান এবং অন্য শক্তির জন্য আরও জায়গা তৈরি হবে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং বঙ্গোপসাগরীয় কৌশলও নতুন চাপে পড়বে।

ঢাকাকেও বুঝতে হবে, ভারতবিরোধী প্রচার, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ কিংবা সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি করে সুসম্পর্ক হয় না। আবার দিল্লিরও মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশ কোনও অধস্তন রাষ্ট্র নয়। তার সার্বভৌম সিদ্ধান্তে অভিভাবকের মতো আচরণ করলে ক্ষোভ বাড়বে, ভারতের বন্ধু নয়।

এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক আবেগের বদলে পেশাদার কূটনীতি। শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ আইনি ও কূটনৈতিক পথে বিচার হোক। কিন্তু সেই একটি প্রশ্নের কাছে গোটা সম্পর্ককে জিম্মি করা চলবে না। সীমান্ত হত্যা, জলবণ্টন, ভিসা, বাণিজ্য, চিকিৎসা, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সহযোগিতা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চালাতে হবে। মতভেদ থাকলেও সংলাপ থামানো যাবে না।

সবচেয়ে আগে বাঁচাতে হবে দুই দেশের মানুষের সম্পর্ক। রোগী, পর্যটক, ছাত্র, শিল্পী, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীদের পথ কঠিন করলে রাজনৈতিক দূরত্ব আরও বাড়বে। দিল্লি ও ঢাকার সরকার বদলাবে; প্রতিবেশী বদলাবে না।

বিদেশনীতি কোনও নেতার প্রতি আনুগত্য নয়। তা চলে জাতীয় স্বার্থ, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় নীতিতে। ভারতের প্রয়োজন স্থিতিশীল, গণতান্ত্রিক ও সহযোগী বাংলাদেশ; কোনও নির্দিষ্ট নেতার বাংলাদেশ নয়। তাই আমাদের বাংলাদেশ চাই, শুধু হাসিনাকে নয়। আবার হাসিনাবিরোধিতার নামে ভারতবিরোধী বাংলাদেশও নয়। এই ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন দিল্লির আসল পরীক্ষা।

I, Bishnu Pada Biswas, S/0 Late Moti Lal Biswas, declare that my name is incorrectly recorded as "B.P Biswas" in my Driving License No. UP6720010000802. My correct and full name is BISHNU PADA BISWAS, as per Affidavit No. 43AA97058 dated 21/08/2026, sworn before the 1st class Judicial Magistrate, 3rd court, Barrackpore, 24 paraganas (N).

হড়পা বান কি সত্যিই 'হঠাৎ'?

সুব্রত আচার্য

নেপালে পাহাড় ভেঙে বরফ, জল, কাদা ও পাথরের স্রোত প্রায় একশো কিলোমিটার ছুটে গেল। ক্ষতিগ্রস্ত হল জনপদ, সেতু, সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো। দীর্ঘ হচ্ছে মৃত ও নিখোঁজ মানুষের তালিকা। এই বিপর্যয়ের পরে গোটা বিশ্বে প্রশ্ন উঠেছে; এমন হড়পা বান কেন হয়? এর জন্য কি শুধু প্রকৃতিই দায়ী, না কি বিপদের ভিত মানুষও তৈরি করছে?

হড়পা বান সাধারণ বন্যা নয়। সাধারণ বন্যায় জলস্তর তুলনামূলক ধীরে বাড়ে। হড়পা বানে কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিপুল জল নেমে আসে। পাহাড়ি এলাকায় অতিবৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভূমিধসে নদী আটকে যাওয়া, প্রাকৃতিক বাঁধ ভাঙা কিংবা হিমবাহ-হ্রদ ফেটে এই বিপদ ঘটতে পারে।

খাড়া ঢাল ও সরু উপত্যকা জলের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সেই জল নীচে নামার সময় পাথর, বরফ, গাছ ও আলগা মাটি সঙ্গে নেয়। ফলে যা প্রথমে জলের ঢল ছিল, সেটিই ক্রমে ভারী ধ্বংসস্রোতে পরিণত হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা একে অনেক ক্ষেত্রে 'ধারাবাহিক বিপদ' বলছেন। অর্থাৎ একটি ঘটনা পরবর্তী একাধিক বিপর্যয়ের জন্ম দেয়।

নেপালের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরও জটিল। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা ইউএসজিএসের ২৭ আগস্টের প্রাথমিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, লাংটাং জাতীয় উদ্যানের কাছে হিমবাহ-যুক্ত একটি পাহাড়ি ঢালের দ্রুত পতন থেকেই সম্ভবত বিপর্যয়ের সূচনা। ওই ধসে যে ভূকম্পন সংকেত তৈরি হয়েছিল, তার শক্তি ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্পের সমতুল্য। সেটি কোনও ভূমিকম্পের সরকারি ঘোষণা নয়। ধসের বরফ, জল ও পাথর নদীপথে আরও ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করে প্রায় একশো কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

ইউএসজিএস স্পষ্ট করে জানিয়েছে, প্রাথমিক ঘটনাটি হিমবাহের সরাসরি পতন, না কি হিমবাহের অংশকে সঙ্গে নেওয়া ভূমিধস;তা এখনও নিশ্চিত নয়। ফলে এই বিপর্যয়কে এখনই শুধু 'হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরণ' বলা বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক হবে না। উপগ্রহচিত্র, ভূকম্পন সংকেত, আবহাওয়ার তথ্য এবং ঘটনাস্থলের নমুনা পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগ নেই।

পরিবেশবিজ্ঞানীরা অবশ্য বৃহত্তর বিপদের দিকে আঙুল তুলছেন। পৃথিবী উষ্ণ হলে হিমবাহ দ্রুত গলে এবং পিছিয়ে যায়। তার সামনে তৈরি হয় নতুন হ্রদ। অনেক ক্ষেত্রে সেই হ্রদের বাঁধ গঠিত হয় আলগা পাথর, নুড়ি ও মাটির স্তূপে। ভূমিকম্প, তুষারধস অথবা পাহাড় থেকে বড় পাথর হ্রদে পড়লে বিশাল ঢেউ উঠতে পারে। দুর্বল প্রাকৃতিক বাঁধ উপচে বা ভেঙে জল নীচের জনপদে নেমে আসে।

উষ্ণায়নের আর একটি বিপদ 'পার্মাফ্রস্ট' বা দীর্ঘকাল জমে থাকা পাহাড়ি মাটির বরফ গলে যাওয়া। এই বরফ পাহাড়ের পাথর ও মাটিকে অদৃশ্য আঠার মতো ধরে রাখে। বরফ গলে গেলে ঢাল আলগা ও অস্থিতিশীল হয়। বাড়ে শিলা, বরফ ও ভূমিধসের আশঙ্কা।

তবে একটি নির্দিষ্ট বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করতে দীর্ঘমেয়াদি তথ্য প্রয়োজন। বিজ্ঞান বলছে, উষ্ণায়ন প্রতিটি ধস বা বন্যার একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু তা হিমালয়ের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে বিপদের পরিবেশকে আরও অনুকূল করে তুলছে।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট বা আইসিআইএমওডের 'হাই-ওয়াইজ' রিপোর্ট বলছে, ২০১১ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে হিন্দুকুশ, হিমালয়ের হিমবাহ আগের দশকের তুলনায় ৬৫ শতাংশ দ্রুত বরফ হারিয়েছে। বর্তমান নির্গমনের গতিপথ চললে শতাব্দীর শেষে এই অঞ্চলের হিমবাহ বর্তমান আয়তনের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত হারাতে পারে। প্রায় ২০০টি হিমবাহ-হ্রদকে ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই পর্বতমালার বরফ ও তুষারের উপর পাহাড়ের প্রায় ২৪ কোটি এবং ভাটির অঞ্চলের আরও ১৬৫ কোটি মানুষ কোনও না কোনও ভাবে নির্ভরশীল। তাই হিমালয়ের পরিবর্তনকে কোনও একটি দেশের স্থানীয় পরিবেশগত সমস্যা বলে দেখার সুযোগ নেই।

নেচার কমিউনিকেশনস-এ ২০২৩ সালে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, শুধু হিমবাহ-হ্রদের আয়তন দেখে বিপদ নির্ধারণ করা যথেষ্ট নয়। হ্রদের উপরে অস্থিতিশীল পাহাড় রয়েছে কি না, প্রাকৃতিক বাঁধ কতটা দুর্বল এবং সম্ভাব্য স্রোতের পথে কত মানুষ ও পরিকাঠামো রয়েছে;সব মিলিয়েই ঝুঁকি তৈরি হয়।

নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর ২০২১ সালের গবেষণা সতর্ক করেছে, হিমবাহ গলে নতুন হ্রদ তৈরির সঙ্গে 'থার্ড পোল' অঞ্চলে ভবিষ্যতে হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরণের ঝুঁকি বাড়তে পারে। তিব্বত মালভূমি, হিমালয়, হিন্দুকুশ ও তিয়েন শান পর্বতমালা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে ২০২৬ সালের ২৭ আগস্ট। ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস অ্যান্ড আর্থ সিস্টেম সায়েন্সেস জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি নেপালের থামে উপত্যকার ২০২৪ সালের বিপর্যয় বিশ্লেষণ করেছে। সেখানে একটি ছোট উজানের হ্রদ উপচে নীচের আর একটি হ্রদের বাঁধ ভেঙে দেয়। দু'টি হ্রদ থেকে প্রায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজার ঘনমিটার জল বেরিয়ে মাত্র ২২ থেকে ২৫ মিনিটে থামে গ্রামে পৌঁছেছিল। সর্বোচ্চ প্রবাহ ছিল সেকেন্ডে ৮০০ ঘনমিটারের বেশি। গবেষণাটি দেখিয়েছে, ছোট হ্রদও ধারাবাহিক ভাঙনের মাধ্যমে বড় বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

কিন্তু বিপর্যয়ের মাত্রা শুধু জল বা পাথর নির্ধারণ করে না। নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বসতি, অপরিকল্পিত সড়ক, পাহাড় কেটে নির্মাণ, অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিকাঠামো ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বিপদের মানচিত্র অগ্রাহ্য করে উন্নয়ন চালালে প্রকৃতির একটি ঘটনা সহজেই মানবিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

উপায় রয়েছে। উপগ্রহের মাধ্যমে হ্রদ ও ঢাল পর্যবেক্ষণ, স্বয়ংক্রিয় জলস্তর মাপক, ভূকম্পন সেন্সর, মোবাইল সতর্কতা এবং কার্যকর সাইরেন প্রয়োজন। তবে যন্ত্র বসালেই দায়িত্ব শেষ হয় না। সতর্কবার্তা শেষ জনপদে পৌঁছচ্ছে কি না, মানুষ তার অর্থ বুঝছেন কি না এবং নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার পথ রয়েছে কি না;সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

নেপাল, ভারত, ভুটান ও চিনের মধ্যে নদী, হিমবাহ এবং পাহাড়ি হ্রদের তথ্য দ্রুত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা জরুরি। হিমালয়ের বিপদ কোনও দেশের সীমান্ত মানে না। সিকিম, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও অরুণাচলও একই ঝুঁকির সামনে দাঁড়িয়ে। তাই বিপর্যয়ের পরে ত্রাণ পাঠানোই যথেষ্ট নয়; আগাম তথ্য বিনিময়ের আঞ্চলিক ব্যবস্থা তৈরিতে ভারতকে নেতৃত্ব নিতে হবে।

হড়পা বান হঠাৎ আসে। কিন্তু বিপদ এক দিনে তৈরি হয় না। বিজ্ঞান বহু আগেই সতর্ক করছে। সেই সতর্কতা উপেক্ষা করে পাহাড় কাটা, নদীর জায়গা দখল এবং ধ্বংসস্রোতের পথে নির্মাণ চলতে থাকলে পরবর্তী বিপর্যয়কে আর নিছক 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' বলা যাবে না। তখন প্রশ্ন উঠবে; প্রকৃতি কি আমাদের চমকে দিয়েছে, না কি জেনেশুনেই আমরা মৃত্যুর পথ তৈরি করেছি?

প্রধান সূত্র ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে, ২৭ আগস্ট ২০২৬; আইসিআইএমওড; হাই-ওয়াইজ রিপোর্ট, ২০২৩; আইপিসিসি; স্পেশাল রিপোর্ট অন দ্য ওশান অ্যান্ড ক্রায়োস্ফিয়ার; নেচার কমিউনিকেশনস, ২০২৩; নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ, ২০২১; ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস অ্যান্ড আর্থ সিস্টেম সায়েন্সেস, ২৭ আগস্ট ২০২৬।

কলকাতায় এক আগুন, শত প্রশ্ন!

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী

'ভাবিয়া করিও কাজ'। কলকাতার আবাসিক হোটেলে আগুন লাগার পর প্রশাসনের ভূমিকা দেখে এই কথাটিই বারবার মনে পড়ছিল।

কেন বলছি?

সেদিন নিউ মার্কেট এলাকার মির্জা গালিব স্ট্রিট, সদর স্ট্রিট, মার্কুইস স্ট্রিট ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ঢুকতেই থমকে যেতে হচ্ছিল। বড় বড় ট্রলি-ব্যাগ নিয়ে হোটেলের খোঁজে ঘুরছেন বাংলাদেশ থেকে আসা পর্যটকেরা। কেউ চিকিৎসার জন্য এসেছেন। কেউ ব্যবসার কাজে। কেউ আবার নিছক বেড়াতে।

কিন্তু তাঁরা থাকবেন কোথায়?

শিখা ইন-এর অগ্নিকাণ্ডে সাত বাংলাদেশি-সহ ন'জনের মৃত্যুর পর কলকাতা পুরসভা হোটেল ও অতিথিশালাগুলির অগ্নিনিরাপত্তা, নির্মাণের অনুমোদন এবং ব্যবসায়িক লাইসেন্স পরীক্ষা শুরু করে। প্রথম দফায় ১৬টি হোটেল ও অতিথিশালা বন্ধ করা হয়। কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয় আরও ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে। ছ'দিনের মধ্যে প্রায় ২০০টি হোটেল ও অতিথিশালাকে বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেরাই ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়।

এই মামলায় শিখা ইন-এর মালিক বীরেশ্বর মিত্র এবং হোটেলটির লিজগ্রহীতাকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের অভিযোগ, অল্প জায়গার মধ্যে অগ্নিনিরাপত্তাবিধি না মেনে একাধিক ঘর তৈরি করা হয়েছিল। তবে আগুন লাগার নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে ফরেন্সিক তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি।

এবার তদন্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে। কলকাতা পুরসভার নোটিস পাওয়া অভিযুক্ত হোটেলমালিকদের ৫ সেপ্টেম্বর শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তাঁদের অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, ভবনের ব্যবহারের চরিত্র বদলের অনুমতি, ট্রেড লাইসেন্স এবং অগ্নিনিরাপত্তার নথি দেখাতে হবে। সেই শুনানিতেই অনেক হোটেলের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে পারে।

সমস্যাটি শুধু অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা অথবা না রাখার নয়। পুরসভার পরিদর্শনে অভিযোগ উঠেছে, বহু বাড়ি অনুমোদিত নকশায় আবাসিক ভবন বা ফ্ল্যাটবাড়ি হিসেবে তৈরি হয়েছিল। পরে বিল্ডিং প্ল্যানের তোয়াক্কা না করে দেওয়াল তুলে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে সেগুলিকে হোটেল ও অতিথিশালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

এই পরিবর্তনের জন্য পুরসভার পৃথক অনুমোদন প্রয়োজন। আবাসিক ভবনকে বাণিজ্যিক হোটেল হিসেবে ব্যবহার করতে গেলে ভবনের চরিত্র বদলের ছাড়পত্রও নিতে হয়। পর্যাপ্ত সিঁড়ি, জানলা, খোলা জায়গা, জরুরি নির্গমন পথ এবং দমকলের প্রবেশের ব্যবস্থা না থাকলে ফায়ার বা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত ক্ষীণ।

তাহলে উপায় কী?

পুরসভার অবস্থান এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট; মালিকদের বৈধ নথি দেখাতে হবে। ত্রুটি সংশোধনযোগ্য হলে অনুমোদিত নকশা ও অগ্নিনিরাপত্তাবিধি মেনে নতুন করে আবেদন করার সুযোগ থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে কাঠামোটিই বেআইনিভাবে বদলে ফেলা হয়েছে, সেখানে শুধু অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বসিয়ে ছাড়পত্র পাওয়ার কথা নয়। অবৈধ অংশ সরানো, ভবনকে অনুমোদিত অবস্থায় ফেরানো অথবা হোটেল হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করা ছাড়া অন্য পথ থাকবে কি না, তা শুনানি ও পরবর্তী প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে পরিষ্কার হবে। কোনও সামগ্রিক এককালীন বৈধকরণ প্রকল্প এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

নিরাপত্তার প্রশ্নে এই অভিযান জরুরি ছিল। যে আবাসিক ভবনে পর্যাপ্ত জানলা, বিকল্প সিঁড়ি অথবা জরুরি নির্গমন পথ নেই, সেখানে মানুষকে থাকতে দেওয়া যায় না। বেআইনি হোটেল বন্ধ করাও প্রশাসনের দায়িত্ব। কিন্তু সিদ্ধান্তটি কীভাবে কার্যকর করা হল, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েই।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আসা পর্যটকদের জন্য কোনও কেন্দ্রীয় সহায়তাকেন্দ্র, বৈধ ও নিরাপদ হোটেলের সহজলভ্য অভিন্ন তালিকা কিংবা অস্থায়ী আবাসনের দৃশ্যমান ব্যবস্থা চোখে পড়েনি। ফলে অনেকে এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে ঘুরেছেন। কেউ নিউ মার্কেট ছেড়ে মুকুন্দপুর বা শহরের অন্য এলাকায় গিয়েছেন। কেউ নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ফিরে যাওয়া কয়েকজন যাত্রীর অভিযোগ, চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কিছু হোটেল দেড় থেকে প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া চেয়েছে। কেউ কেউ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একাধিকবার হোটেল বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। এগুলি সংশ্লিষ্ট পর্যটকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; ভাড়া বৃদ্ধির কোনও পূর্ণাঙ্গ সরকারি হিসাব এখনও প্রকাশিত হয়নি।

আচ্ছা বলুন তো, এই হয়রানির সবটাই কি অনিবার্য ছিল?

বেআইনি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবে;এ নিয়ে আপত্তি নেই। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা অতিথিদের নিরাপদ বিকল্প না দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার দায় বর্তমান প্রশাসন এড়াতে পারে না।

কলকাতা পুরসভা কি দ্রুত বৈধ ও নিরাপদ হোটেলের তালিকা প্রকাশ করতে পারত না? নিউ মার্কেট এলাকায় একটি সহায়তাকেন্দ্র খোলা যেত না? যাঁদের চিকিৎসা চলছিল, তাঁদের হাসপাতালসংলগ্ন আবাসনে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেত না? সীমান্ত, বাস কাউন্টার ও পর্যটন দফতরের মাধ্যমে কলকাতায় আসার আগেই তাঁদের সতর্ক করা সম্ভব ছিল না?

কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার মহম্মদ খালেদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন সার্বক্ষণিক সহায়তা নম্বর চালু করেছে। নিহতদের পরিবারকে মরদেহ সংরক্ষণ, পরিবহণ ও দেশে ফেরানোর কাজেও সহায়তা করেছে তারা। ছ'জনের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। সপ্তম বাংলাদেশি নাগরিকের শেষকৃত্য তাঁর পরিবারের ইচ্ছায় কলকাতায় করা হয়।

উপ-হাইকমিশনের এই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হেল্পলাইনের তথ্য যথেষ্ট প্রচার পায়নি। সমস্যায় পড়া পর্যটকদের নিরাপদ আবাসন খুঁজে দেওয়া এবং কলকাতা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য তারা হয়তো নিজেদের মতো করে কাজ করেছে, কিন্তু সঠিক সময়ে সেই তথ্য প্রচারের আলোয় আসেনি।

মধ্য কলকাতার হোটেলমালিকদের একাংশ বন্ধের নির্দেশের বিরুদ্ধে আইনি পথে যাওয়ার কথা ভাবছেন। তাঁদের দাবি, প্রায় ২০০টি হোটেলের আড়াই থেকে তিন হাজার ঘর অভিযানে প্রভাবিত হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্যের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের এই দাবিরও স্বাধীন যাচাই প্রয়োজন। তবে এত বিপুল সংখ্যক ঘর একসঙ্গে ব্যবস্থার বাইরে চলে গেলে আবাসন সংকট তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এই সংকটের প্রভাব শুধু হোটেলে আটকে নেই। বাংলাদেশি পর্যটকদের ঘিরে নিউ মার্কেট এলাকায় খাবার, পরিবহণ, ওষুধ, কেনাকাটা ও ছোট ব্যবসার বড় বাজার তৈরি হয়েছে। পর্যটকেরা এলাকা ছাড়লে সেই অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবচেয়ে অস্বস্তিকর আপডেটটি অবশ্য অন্য জায়গায়। পুরসভার পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে, বহু আবাসিক ভবন প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই হোটেল বা অতিথিশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ তাদের অনেকের ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনে নবীকরণ হয়েছে। বর্তমান অনলাইন ব্যবস্থায় লাইসেন্স নবীকরণের আগে প্রতিবার সরেজমিন পরীক্ষা বাধ্যতামূলক না থাকায় এই ফাঁক তৈরি হয়েছে বলে পুরসভার তদন্তে উঠে এসেছে। এই অবৈধতার ইতিহাসও আজকের নয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পুর প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একাংশের বক্তব্য, বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালেই মধ্য কলকাতার পুরনো বাড়ি ও ফ্ল্যাট ভেঙে ছোট আবাসিক হোটেল তৈরির প্রবণতা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু সেই অভিযোগের আড়ালে পরবর্তী তৃণমূল পরিচালিত প্রশাসন নিজের দায় এড়াতে পারে না। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও তারা এই অনিয়মে কার্যকর রাশ টানেনি। বরং লাইসেন্স নবীকরণ এবং নজরদারির ফাঁক দিয়েই বহু প্রতিষ্ঠান চলতে থেকেছে।

এখন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন প্রশাসন ক্ষমতায়। মির্জা গালিব স্ট্রিটের আগুন তাদেরও চোখ বন্ধ করে থাকার সুযোগ দেয়নি। সরাসরি অভিযান, বন্ধের নোটিস, গ্রেফতার এবং মালিকদের শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত;এই কঠোরতা প্রয়োজনীয়। কিন্তু শুধু আগের দুই সরকারের ব্যর্থতা দেখিয়ে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব শেষ হবে না। অভিযানের পরে নিরাপদ ও আইনসম্মত সমাধান তৈরি করাই হবে তাদের আসল পরীক্ষা।

তাহলে প্রশ্নটি শুধু কয়েকজন হোটেলমালিকের বেআইনি কাজ নিয়ে নয়। আবাসিক ভবন বাণিজ্যিক হোটেলে বদলে গেল, বছরের পর বছর লাইসেন্স নবীকরণ হল, অতিথিরা সেখানে থাকলেন;অথচ পুরসভা, দমকল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানল না কেন? একটি ভয়াবহ আগুন না লাগলে কি এই অনিয়ম সামনে আসত?

এখন তিনটি পদক্ষেপ জরুরি। প্রথমত, প্রতিটি হোটেলের অনুমোদিত নকশা ও বাস্তব কাঠামো মিলিয়ে দেখা। দ্বিতীয়ত, পুরসভা, দমকল, পুলিশ ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে একটি অভিন্ন ডিজিটাল অনুমোদনব্যবস্থা তৈরি করা। তৃতীয়ত, বৈধ ও নিরাপদ হোটেলের প্রকাশ্য তালিকা তৈরি করে পর্যটক, হাসপাতাল, পরিবহণ সংস্থা এবং বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাছে পৌঁছে দেওয়া। নিরাপত্তা আর মানবিকতার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। প্রশাসনের কাজ বিপজ্জনক হোটেলের দরজায় তালা দেওয়া। একই সঙ্গে সেই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করাও।

একটি আগুন ন'জনের প্রাণ নিয়েছে। তার পরে নেওয়া ব্যবস্থা যেন আরও কয়েক হাজার মানুষের কাছে কলকাতাকে আতঙ্ক ও হয়রানির শহর করে না তোলে। প্রতিবেশী দেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু কূটনৈতিক বৈঠকে গড়ে ওঠে না। বিপদের সময় তাঁদের সঙ্গে আমরা কেমন আচরণ করছি, সম্পর্কের আসল পরীক্ষা হয় সেখানেই।

বিজেপির পাখির চোখে পুরসভা

➲ চার পাতার পর

কলকাতার কোনও কোনও ওয়ার্ডে জনসংখ্যার চাপ অন্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি। শহরের পরিধি, বসতি এবং নাগরিক চাহিদাও বদলেছে।

কিন্তু ওয়ার্ডের সীমানা বদল মানে শুধু প্রশাসনিক মানচিত্র বদল নয়। তার সঙ্গে বদলে যায় ভোটের অঙ্কও।

কোন পাড়া কোন ওয়ার্ডে গেল, কোন আসন সংরক্ষিত হল, কোনও পুরনো কাউন্সিলরের শক্ত ঘাঁটি দু'ভাগ হয়ে গেল কি না; এই প্রশ্নগুলির উপর বহু প্রার্থীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। ফলে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রতিটি ধাপ স্বচ্ছ এবং যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া জরুরি।

খসড়া মানচিত্র, জনসংখ্যার ভিত্তি, সংরক্ষণের নিয়ম এবং আপত্তি জানানোর সুযোগ স্পষ্ট না হলে বিরোধীরা রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ তুলবেই। ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে বলেই পুরনো প্রশ্নগুলির গুরুত্ব কমে যায়নি। বরং এখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব বিজেপির।

বিজেপির সুযোগ কোথায়?

বিজেপির সবচেয়ে বড় শক্তি সদ্য পাওয়া বিধানসভার জনাদেশ। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকায় উন্নয়ন, অর্থ বরাদ্দ এবং দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রতিশ্রুতি তারা সামনে আনবে। কলকাতা, হাওড়া ও দুর্গাপুরের পুরনো পুরবোর্ডগুলির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বেআইনি নির্মাণ, নিকাশি, পার্কিং, হকার এবং নাগরিক পরিষেবায় অনিয়মের অভিযোগও বিজেপির প্রচারের বড় অস্ত্র হবে।

কিন্তু পুরভোটে শুধু সরকারের নাম চলে না। প্রার্থীর নামও চলে।

একজন কাউন্সিলরকে মানুষ প্রায় প্রতিদিন চোখের সামনে দেখেন। বিপদে ফোন করলে তিনি ধরেন কি না, এলাকার সমস্যায় পাশে থাকেন কি না; এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পুরভোটে বড় ভূমিকা নেয়। বিজেপি যদি বিধানসভার ফলের উপর অতিরিক্ত ভরসা করে প্রার্থী নির্বাচনে ভুল করে, বহু ওয়ার্ডে হিসাব উল্টে যেতে পারে।

আরও একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন রয়েছে।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা নেতাদের কতটা জায়গা দেওয়া হবে? তাঁদের সবাইকে দূরে রাখলে স্থানীয় পরিচিত মুখ এবং সংগঠনের অভাব দেখা দিতে পারে। আবার অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে বিজেপির পুরনো কর্মীরা ক্ষুব্ধ হতে পারেন। ক্ষমতার কাছে আসা নতুন মুখ এবং দীর্ঘদিনের কর্মীদের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই সুকান্ত মজুমদারদের বড় পরীক্ষা।

সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, বিজেপি একক শক্তিতে কলকাতার পুরভোটে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অর্থাৎ জয়ের কৃতিত্ব যেমন সম্পূর্ণ দলের হবে, ব্যর্থতার দায়ও অন্য কারও উপর চাপানোর সুযোগ থাকবে না।

কলকাতায় তিনটি ওয়ার্ড থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছনোর পথ অবশ্য রাজনৈতিক স্লোগানের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

তৃণমূল কি শেষ হয়ে গিয়েছে?

বিধানসভায় পরাজয়ের অর্থ তৃণমূলের স্থানীয় সংগঠন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নয়। কলকাতা ও আশপাশের পুর এলাকায় দলটির পুরনো কাউন্সিলর, ওয়ার্ডকর্মী, ক্লাব এবং নাগরিক পরিষেবার সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগ রয়েছে। পুরভোটে এই স্থানীয় সম্পর্ক তৃণমূলের সবচেয়ে বড় ভরসা হতে পারে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ভাষ্যও স্পষ্ট। তিনি বিজেপিকে রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নির্বাচন কমিশন এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করেছে। বিজেপি সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মমতার দাবির সমর্থনে এখনও স্বাধীনভাবে যাচাইযোগ্য প্রমাণ প্রকাশিত হয়নি।

তবে পুরভোটে তৃণমূল শুধু ভোটার তালিকা কিংবা প্রশাসনিক চাপের অভিযোগ তুলে পার পাবে না। আগের পুরবোর্ডগুলির কাজের হিসাবও তাদের দিতে হবে। কোথাও রাস্তা ভাঙা, কোথাও নিকাশি বেহাল, কোথাও বেআইনি নির্মাণ; এই অভিযোগের দায় দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা দলের উপরেই আসবে।

তৃণমূলের দ্বিতীয় সমস্যা প্রার্থী নির্বাচন। পুরনো কাউন্সিলরদের কতজন দলের সঙ্গে থাকবেন, কার বিরুদ্ধে স্থানীয় ক্ষোভ রয়েছে এবং দলত্যাগের পরে কোথায় নতুন মুখ দিতে হবে; এই সিদ্ধান্তগুলিতে ভুল হলে পুরনো সংগঠনের সুবিধাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বামফ্রন্টের সামনে ছোট দরজা, বড় সুযোগ

বামফ্রন্টও পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে। সংবাদ প্রতিদিন জানিয়েছে, পুরনো ভাগের অঙ্ক ধরে নয়, যে ওয়ার্ডে যে শরিকের সংগঠন শক্তিশালী, সেখানে সেই দলকে প্রার্থী করার নতুন সূত্র নিয়ে আলোচনা চলছে। আরএসপির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে শরিকদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু হতে পারে।

নতুন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য। ২০৯টি ওয়ার্ডের মানচিত্রে পুরনো আসন-বণ্টনের হিসাব আঁকড়ে থাকলে জোটের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে।

বামেদের সামনে জায়গা খুব বড় নয়, কিন্তু একেবারে বন্ধও নয়। বিজেপি সরকারের কাজে অসন্তোষ তৈরি হলে তার সবটাই যে তৃণমূলে ফিরে যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। শহরের কিছু এলাকায় বাম কর্মীদের স্থানীয় উপস্থিতি এখনও রয়েছে। গ্রহণযোগ্য প্রার্থী এবং নাগরিক সমস্যা নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন তাদের কয়েকটি ওয়ার্ডে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনতে পারে।

তবে বামফ্রন্টের পুরনো সমস্যাও রয়ে গিয়েছে। ভোট থাকলেও তা আসনে বদলাতে পারছে না। শরিকি দাবি, দুর্বল সংগঠন এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে দূরত্ব; এই তিনটি সমস্যা না কাটলে নতুন সূত্রও কাগজে থেকে যাবে।

ভোট কবে?

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, উৎসবের মরসুমের পরে কলকাতা, হাওড়া, বালি ও দুর্গাপুরের নির্বাচন করানোর বিষয়ে রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব রাখবে। সংবাদমাধ্যমে নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে।

কিন্তু ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়নি।

রাজ্য সরকার সম্ভাব্য সময় জানাতে পারে। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতিও নিতে পারে। তবে ভোটের চূড়ান্ত দিন ঘোষণা এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। ফলে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যকে এখনই নির্বাচনী নির্ঘণ্ট হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।

তাহলে এই পুরভোটে কী হতে পারে?

বিজেপি বিধানসভার জনাদেশকে স্থানীয় শাসনে বিস্তার করতে চাইবে। তৃণমূল পুরনো সংগঠন ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। বামফ্রন্ট নিজের হারানো শহুরে জায়গা ফিরে পেতে চাইবে। নতুন ওয়ার্ডের কারণে বহু নতুন মুখও সামনে আসবেন।

আর কী হওয়া উচিত নয়?

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস যেন শাসক দলের নির্বাচনী অস্ত্র হয়ে না ওঠে। প্রশাসনিক অভিযান যেন বিরোধী দমনের চেহারা না নেয়। আবার বিরোধিতার নামে বেআইনি নির্মাণ কিংবা দুর্নীতির তদন্ত বন্ধ রাখার দাবিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সরকার এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যবর্তী রেখাটি পরিষ্কার রাখতে হবে।

বিজেপির সামনে এবার দুটি লক্ষ্য। পুরসভা জয় করা এবং সেই জয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। প্রথমটি দলের সাংগঠনিক সাফল্য। দ্বিতীয়টি শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে প্রথম সাফল্যও সম্পূর্ণ হবে না।

বিধানসভা নির্বাচন বিজেপিকে ক্ষমতা দিয়েছে। পুরসভা নির্বাচন বলবে, সেই ক্ষমতা মানুষের পাড়ায় পৌঁছেছে, না কি এখনও নবান্নেই আটকে রয়েছে।

একশোয় কত পেল বিজেপি

➲ এক পাতার পর

অনুযায়ী, বিএসএফকে ইতিমধ্যে ৭৬৭ একরের বেশি জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদিত জমি ধরলে পরিমাণ ১,১০০ একর ছাড়িয়েছে। দীর্ঘদিন আটকে থাকা সীমান্তের জমির জট খোলাকে সরকারের প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলতেই হবে।

সবচেয়ে বেশি আলোচনা অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি যোগ্য মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু বহু আবেদন এখনও যাচাইয়ের মধ্যে রয়েছে। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সাড়ে চার লক্ষের বেশি অভিযোগ জমা পড়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। কোথাও প্রকৃত দাবিদার বাদ পড়েছেন, কোথাও আবার অযোগ্য ব্যক্তির নাম ঢোকার অভিযোগ উঠেছে। টাকা না পেয়ে কয়েকটি জেলায় বিক্ষোভও হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা, লক্ষ্মীর ভান্ডার ছিল সর্বজনীন প্রকল্প। অন্নপূর্ণা লক্ষ্যভিত্তিক। বিরোধীদের প্রশ্ন, নির্বাচনের আগে এই বাছাইয়ের শর্ত কি একইভাবে স্পষ্ট করা হয়েছিল? প্রদেশ কংগ্রেসের হিসাব, এক কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলাকে মাসে তিন হাজার টাকা দিতে বছরে প্রয়োজন ৫২ হাজার ২০০ কোটি টাকা। বাজেটে বরাদ্দ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। তবে প্রকৃত উপভোক্তার চূড়ান্ত সরকারি সংখ্যা এখনও সামনে আসেনি।

প্রথম কলকাতার সঙ্গে কথা বলা অনেকের অভিযোগ, সরকার এখনও বিরোধী তৃণমূলের সমালোচনায় বেশি সময় ব্যয় করছে। তাঁদের বক্তব্য, মানুষ ভোটের মধ্য দিয়ে তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে। নতুন সরকারের উচিত পুরনো সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে প্রতিদিন কথা না বলে নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণে বেশি মন দেওয়া।

শিল্পেও একই অপেক্ষা। হাওড়ায় আমুলের প্রকল্প, পুরুলিয়ায় ইস্পাত কারখানা এবং শিল্পের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার উৎসাহভাতা ঘোষিত হয়েছে। এক পেশাজীবীর কথায়, আগের সরকারগুলিও শিল্পবান্ধব মনোভাব দেখিয়েছে। কিন্তু সব ঘোষণা কারখানা বা চাকরিতে বদলায়নি। এই সরকারের কাছেও মানুষ শিলান্যাসের বাইরে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের হিসাব চান।

গণমাধ্যমের একাংশ মনে করছে, স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে নতুন সরকার এখনও পর্যন্ত অতীতের সরকারের তুলনায় কিছুটা বেশি উদার। আবার মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদলের কয়েকজন নেতার কিছু বক্তব্য তাঁদের কাছে হুমকির মতোও মনে হয়েছে। নিট-বিক্ষোভে পুলিশের ভূমিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা এবং বিরোধীদের সঙ্গে সংঘাত এই উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এক বছর পরে মানুষের পরীক্ষায় দশে নয় না পেলে তিনি ক্ষমা চাইবেন। আপাতত মানুষের কথার নির্যাস; সীমান্ত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে গতি আছে, কিন্তু জনকল্যাণ, শিল্প, চাকরি এবং বিরোধী মতের প্রতি আচরণে পরীক্ষা এখনও বাকি। একশো দিনের খাতা খুলেছে। চূড়ান্ত নম্বর দেওয়ার সময় এখনও আসেনি।

নেপালে জল নামতেই

➲ এক পাতার পর

শিলাধসে নদীর গতিপথ আটকে যাওয়ার খবর কখন জানা গিয়েছিল? চিন সেই তথ্য কত দ্রুত নেপালকে জানিয়েছিল? নেপালের নিজস্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা কেন নদীর নীচের জনপদগুলিকে সময়মতো সরাতে পারল না? এই প্রশ্নগুলির স্পষ্ট সরকারি উত্তর এখনও মেলেনি। তাই বিপর্যয়ের কারণ এবং দুই দেশের তথ্য আদান-প্রদান নিয়ে স্বাধীন তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে।

উদ্ধার অভিযান নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। নেপাল প্রথম দিকে বিদেশি অনুসন্ধানকারী দলের অবাধ প্রবেশে সম্মতি দেয়নি। সরকারের যুক্তি, বহু দেশের দল একসঙ্গে নামলে সমন্বয়ের সমস্যা হতে পারে। তবে সুড়ঙ্গ উদ্ধার, মৃতদেহ শনাক্তকরণ এবং অস্থায়ী সেতু তৈরিতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে।

ভারত প্রথম দেশগুলির মধ্যে ত্রাণ নিয়ে নেপালে পৌঁছেছে। তিনটি সামরিক বিমানে ৬২ টন তাঁবু, কম্বল, খাবার, ওষুধ ও স্বাস্থ্যসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসা ও সুড়ঙ্গ-উদ্ধার বিশেষজ্ঞরাও সেখানে রয়েছেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের ২৯ আগস্টের হিসাব অনুযায়ী, ৮৮ জন ভারতীয় উদ্ধার হলেও ২৮৭ জনের সঙ্গে তখনও যোগাযোগ করা যায়নি। দিল্লিতে বিশেষ নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা হয়েছে। তবে রাজ্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

মানবিক সংকটও দ্রুত বাড়ছে। রেড ক্রসের হিসাবে প্রায় ৯৩ হাজার মানুষের জরুরি সাহায্য প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অন্তত ১০ হাজার পরিবারকে অবিলম্বে ত্রাণ দিতে হবে। একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ধ্বংস হয়েছে। বিশুদ্ধ জল ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। চিতওয়ানে বহু অশনাক্ত দেহের ডিএনএ নমুনা রেখে অস্থায়ীভাবে সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েও পরিবারের ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

পুনর্গঠনে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার প্রয়োজন হতে পারে; যা নেপালের অর্থনীতির প্রায় এক দশমাংশ। পর্যটন, জলবিদ্যুৎ, কৃষি এবং যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষতি কাটাতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা নিখোঁজদের পরিবারের। দেহ না মিললে মৃত্যুর সরকারি স্বীকৃতি, বিমা, উত্তরাধিকার ও ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া আটকে যেতে পারে। তাই উদ্ধারসামগ্রীর মতোই প্রয়োজন একটি নির্ভুল অভিন্ন তালিকা, দ্রুত ডিএনএ পরীক্ষা এবং প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত সরকারি যোগাযোগ।

এই বিপর্যয় শুধু নেপালের দুর্ভাগ্যের দলিল নয়। হিমালয়ের বিপদ সীমান্ত মানে না; অথচ আগাম সতর্কতার ব্যবস্থা এখনও দেশের সীমানাতেই আটকে। নেপালে কপাল পুড়েছে মানুষের। এখন প্রশ্ন, রাষ্ট্রগুলি কি এই বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেবে?

১১ জনের ঝুলিতে ১০টি সোনা

➲ চার পাতার পর

বাধা। বিদেশে যাতায়াত, থাকা, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের খরচ কম নয়। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বলছেন, সরকার অথবা অন্য কোনও সংস্থা পাশে দাঁড়ালে রাশিয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পথ অনেকটাই সহজ হবে।

নাগপুর থেকে ফিরেই আবার অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন খেলোয়াড়েরা। উৎসব হয়েছে, ছবি উঠেছে, অভিনন্দনও এসেছে। কিন্তু প্রশিক্ষক জানেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে লড়াই আরও কঠিন। তাই পদক গলায় পরেই আবার ঘাম ঝরানো শুরু।

জেলার একটি ছোট প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে জাতীয় মঞ্চে পৌঁছনো সহজ ছিল না। তার পরেও ১১ জনের প্রত্যেকে পদক জিতেছেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নাগপুরে তাঁরা বাংলার হয়ে লড়েছেন। এবার তাঁদের স্বপ্ন; রাশিয়ার মাটিতে ভারতের হয়ে সোনা জেতা।

তথ্য - নোট প্রতিযোগিতার ফলাফল, অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা এবং বাংলা থেকে একমাত্র দল হিসেবে যোগ দেওয়ার তথ্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাডেমি এই পত্রিকাকে জানিয়েছে। প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ ফলাফলের কোনও প্রকাশ্য সরকারি তালিকা পাওয়া যায়নি।

'এক দেশ, এক ভোট' বিজেপির

➲ এক পাতার পর

দিয়েছেন। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পিটিআইয়ের সূত্রে তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশ করেছে। তবে দাবিটির সমর্থনে কোনও পূর্ণাঙ্গ ও পদ্ধতিগত জনসমীক্ষা এখনও প্রকাশিত হয়নি। বিজেপি তিনটি যুক্তি সামনে আনছে। ঘন ঘন নির্বাচনে সরকারি অর্থ ও প্রশাসনিক শক্তির বিপুল ব্যবহার হয়। বারবার আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ায় নীতিগত সিদ্ধান্ত ও উন্নয়নমূলক কাজে প্রভাব পড়ে। ভোটের কাজে শিক্ষক, সরকারি কর্মী ও নিরাপত্তাবাহিনীকে নিয়মিত ব্যবহার করতে হয়। বিজেপি নেতা পুষ্কর সিং ধামির বক্তব্য উদ্ধৃত করে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, একসঙ্গে নির্বাচন হলে ভোটের খরচ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। এটি ধামির দেওয়া হিসাব; নির্বাচন কমিশনের সর্বভারতীয় হিসাব নয়। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এনডিএর আলোচনার টেবিলে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোট করানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ বিজেপি এক ধাক্কায় গোটা দেশে নয়, ধাপে ধাপে ব্যবস্থা কার্যকর করার পথ খুঁজছে।

বিরোধীদের আপত্তিও মৌলিক। এনডিটিভি এবং দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম যৌথ কমিটির সামনে প্রস্তাবটিকে অসাংবিধানিক এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলেছেন। তাঁর যুক্তি, নির্বাচিত বিধানসভার মেয়াদ কমানো জনাদেশকে অসম্মান করার শামিল। বিরোধীদের আশঙ্কা, একসঙ্গে নির্বাচন হলে স্থানীয় বিষয় জাতীয় প্রচারের আড়ালে চলে যাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হবে। নিরন্তর নির্বাচনী ব্যয় ও প্রশাসনিক ব্যস্ততা বাস্তব সমস্যা। কিন্তু সমাধান এমন হতে হবে, যাতে রাজ্যের স্বর ও জনাদেশ দুর্বল না হয়। প্রয়োজনীয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া 'এক দেশ, এক ভোট' তাই আপাতত শক্তিশালী রাজনৈতিক স্লোগান; সাংবিধানিক বাস্তবতা নয়।

যাদবপুরে যত কাণ্ড!

➲ এক পাতার পর

কাছে ছবি ও ভিডিও চেয়েছে।

কারা প্রথম হামলা করেছিল, বিষয়টি তদন্ত চলছে। সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা-কে বলেন, ''এসএফআই কোথাও ছিল না।'' তাঁর অভিযোগ, এবিভিপি বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকে অশান্তি করেছে। এবিভিপির পাল্টা দাবি, তাদের সমর্থকদের উপর বামপন্থীরাই হামলা চালিয়েছে এবং জাতপাত তুলে অপমান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক ভাঙার দায়ও অস্বীকার করেছে সংগঠনটি। পরদিন বাম ছাত্র সংগঠন ও এবিভিপির পৃথক মিছিল যাদবপুর থানা চত্বরে পৌঁছলে দু'পক্ষই পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা ঘটনাটিকে ''বাম,এবিভিপির তুলকালাম'' বলে বর্ণনা করেছে। দ্য টেলিগ্রাফ গুরুত্ব দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশে অভিযোগ এবং প্রতীক ভাঙার দায় নিয়ে এবিভিপির অস্বীকারকে। টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখেছে, প্রতীক মেরামত হলেও ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ক্ষত রয়ে গিয়েছে। আনন্দবাজার সামনে এনেছে তদন্ত কমিটি, পুলিশে অভিযোগ এবং দুই পক্ষের প্রতিবাদ।

এর মধ্যেই ক্যাম্পাসের দেওয়ালে থাকা কয়েকটি লেখা ও ছবি নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, ''হুমকির সংস্কৃতি এবার বন্ধ করতে হবে।'' তিনি বলেন, যাদবপুরেও ''জাতীয়তাবাদী জাগরণ'' হবে। 'কিযানজি জিন্দাবাদ', শরজিল ইমামের ছবি এবং কয়েকটি রাজনৈতিক গ্রাফিতিকে ''দেশবিরোধী'' আখ্যা দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৯ আগস্ট যাদবপুরে আয়োজিত কর্মসূচিতে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিতর্কিত দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি চার্লি চ্যাপলিনের মুরাল ও ফ্যাসিবাদবিরোধী কিছু লেখাও সাদা রং দিয়ে ঢেকে দেয়। এর প্রতিবাদে একদল ছাত্র ''দেওয়াল পুনর্দখল''-এর ডাক দিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, আপত্তিকর বা হিংসার পক্ষে লেখা সরানো যেতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক মত প্রকাশ নির্বিচারে মুছে ফেলা গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষক ও প্রাক্তনীদের একাংশ আবার সব পক্ষের হিংসা ও ভাঙচুরের নিন্দা করে ক্যাম্পাসে নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, যাদবপুরে লড়াইটি এখন আর শুধু বাম বনাম এবিভিপির নয়। ক্যাম্পাসের শৃঙ্খলা কে ঠিক করবে, কোন বক্তব্য দেশবিরোধী এবং মত প্রকাশের সীমা কোথায়; সেই অধিকার নিয়েও সংঘাত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও একটি পক্ষকে দায়ী করা যেমন ঠিক নয়, তেমনই জাতীয়তাবাদ বা স্বাধীন মত প্রকাশের আড়ালে হিংসাকেও ছাড় দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশিরা থাকবেন

➲ এক পাতার পর

৩১ আগস্ট পর্যন্ত পুরসভা বা পর্যটন দফতরের তরফে বৈধ, নিরাপদ এবং তুলনামূলক কম ভাড়ার হোটেলের কোনও সহজলভ্য অভিন্ন তালিকা প্রকাশ্যে পাওয়া যায়নি। কতগুলি ঘর ব্যবহারযোগ্য, কোথায় কত ভাড়া; তারও সরকারি হিসাব নেই।

কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন ২৪ ঘণ্টার সহায়তা নম্বর চালু করেছে। নিরাপদ আবাসিক হোটেলের তালিকা দেওয়া হচ্ছে; এমন নিশ্চিত তথ্য না মিললেও চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখে ফিরে যাওয়া পর্যটকদের জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে তাঁদের হয়ে কলকাতার চিকিৎসক এবং বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে উপ-হাইকমিশন। ফলে বাংলাদেশি রোগীরা আবার কলকাতায় এলে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।

কিন্তু তখন তাঁরা থাকবেন কোথায়?

বেআইনি হোটেল বন্ধ হতেই হবে। তবে চিকিৎসার জন্য আসা মানুষকে শুধু বলা যায় না; ''এখানে থাকা যাবে না।'' তাঁকে কোথায় রাখা যাবে, সেটিও জানাতে হবে।

নিরাপত্তা এবং মানবিকতার পরীক্ষা আসলে সেখানেই।

খবরের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৩১৭১১৬ | খবরের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৩১৭১১৬

অশোকনগরে মাটির নীচ থেকে উঠে আসছে 'কালো সোনা'

সৌমেন রায় চৌধুরী



বাইগাছির চেনা ছবিটা এখন বদলে গিয়েছে। গ্রামের রাস্তা ধরে এগোলেই চোখে পড়ছে ওএনজিসির উঁচু পাম্পজ্যাক। ভারী যন্ত্রের একটানা শব্দ। পাশে দাঁড়িয়ে বিশেষ ট্যাঙ্কার। সেই ট্যাঙ্কারেই অশোকনগরের মাটির নীচ থেকে উঠে আসা অপরিশোধিত তেল পাড়ি দিচ্ছে হলদিয়ার শোধনাগারে।

দীর্ঘ আট বছরের অপেক্ষা। মাঝে তেল মিলেছিল, আবার উৎপাদন থমকেও গিয়েছিল। কখনও প্রযুক্তিগত সমস্যা, কখনও জমির জট। অবশেষে শুক্রবার অশোকনগরের বাইগাছি তৈলক্ষেত্র থেকে বাণিজ্যিকভাবে অপরিশোধিত তেল উত্তোলন শুরু করল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওএনজিসি।

প্রথম দিনে প্রায় ১২ হাজার লিটার অপরিশোধিত তেল ট্যাঙ্কারে তুলে হলদিয়া শোধনাগারের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। ট্যাঙ্কারের যাত্রার সূচনা করেন ওএনজিসির ডিরেক্টর এক্সপ্লোরেশন ওমপ্রকাশ সিনহা এবং অশোকনগরের বিধায়ক চিকিৎসক সুময় হীরা।

ঘটনাস্থলে ওএনজিসির আধিকারিকেরা এই পত্রিকাকে জানিয়েছেন, প্রায় ২,৩৯৬ মিটার গভীর থেকে তেল উঠছে। প্রথম পর্যায়ে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ ঘনমিটার, অর্থাৎ প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার লিটার অপরিশোধিত তেল তোলার লক্ষ্য রয়েছে। উৎপাদন স্থিতিশীল হলে পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

তবে কূপ থেকে ওঠা তরল পুরোটাই তেল নয়। তার সঙ্গে জলও থাকছে। বাইগাছির কেন্দ্রেই বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জল ও অপরিশোধিত তেল আলাদা করা হচ্ছে। তার পরে ট্যাঙ্কারে পাঠানো হচ্ছে হলদিয়ায়। শোধনাগারে সেই অপরিশোধিত তেল থেকে পেট্রল, ডিজেল এবং অন্য পেট্রোপণ্য আলাদা করা হবে।

২০১৮ সালে বাইগাছিতে প্রথম তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ২০২০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে প্রায় ৩৭৫ ব্যারেল অপরিশোধিত তেলও তোলা হয়। কিন্তু পরে আগের কূপে প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেয়। উৎপাদন থমকে যায়।

ওমপ্রকাশ সিনহা বলেন, আগের কূপের তেল শেষ হয়ে গিয়েছিল; এমন নয়। প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই উৎপাদন বন্ধ হয়েছিল। গত কয়েক বছরে নতুন করে অনুসন্ধান চালিয়ে আরও কয়েকটি জায়গায় তেল ও গ্যাসের উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। নতুন কূপের তেলের মানও আগের তুলনায় ভাল বলে জানিয়েছেন তিনি।

ওএনজিসির দেওয়া তথ্য বলছে, নতুন উন্নয়নমূলক কূপটি পুরনো কূপের প্রায় ৯৫ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে খনন করা হয়েছে। সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, অশোকনগরে আরও পাঁচ থেকে ছ'টি কূপ খোঁড়া হতে পারে। বাইগাছির পাশাপাশি ভুরকুন্ডা, দৌলতপুর ও সংলগ্ন এলাকায় অনুসন্ধানের কাজও চলছে।

অশোকনগরের তেলের মান নিয়েও আশাবাদী আধিকারিকেরা। প্রাথমিক পরীক্ষায় এই হালকা অপরিশোধিত তেলের এপিআই গ্র্যাভিটি ৪০ থেকে ৪১-এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। ২০২৪ সালে লোকসভায় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের দেওয়া তথ্যেও অশোকনগরের তেলকে মুম্বই হাই এবং ব্রেন্ট ক্রুডের সঙ্গে তুলনীয় বলা হয়েছিল। তবে তেলের মান তুলনীয় হওয়া আর মজুত বা উৎপাদনের পরিমাণ সমান হওয়া এক কথা নয়। অশোকনগরকে এখনই 'দ্বিতীয় বম্বে হাই' বলা তাই তাড়াহুড়ো হবে।

এ দিন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ওমপ্রকাশ সিনহা বলেন, ভারতকে এখনও প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় অর্ধেক বিদেশ থেকে আনতে হয়। অশোকনগরের উৎপাদন জাতীয় চাহিদার তুলনায় খুবই ছোট। কিন্তু দেশের মাটিতে এমন প্রতিটি নতুন উৎপাদনই আমদানিনির্ভরতা কমানোর দীর্ঘ লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিধায়ক সুময় হীরার কথায়, "তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় কাজ বন্ধ ছিল না। সমস্যা ছিল প্রযুক্তিগত। সেই বাধা কাটিয়েই আবার যাত্রা শুরু হল।" তাঁর দাবি, নতুন কূপ খোঁড়ার পথে থাকা জমি-সংক্রান্ত জটও অনেকটা মিটেছে। আপাতত বাইগাছিতে উৎপাদন চলবে। পরে অন্য জায়গাতেও কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

তেল উত্তোলন শুরু হওয়ায় স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশাও বেড়েছে। ভারী গাড়ি চলাচলের জন্য বাইগাছি কেন্দ্রের রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয়েছে। ওএনজিসির তরফে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং স্থানীয় পরিকাঠামোর উন্নয়নে সহযোগিতার কথাও বলা হয়েছে। কর্মসংস্থানের আশা করছেন এলাকার যুবকেরা। তবে কতজন স্থানীয় মানুষ সরাসরি কাজ পাবেন, তার কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

ওএনজিসি সূত্রের দাবি, অশোকনগরের অনুসন্ধান ও পরিকাঠামো তৈরিতে এখনও পর্যন্ত প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় মোট ছ'টি কূপ রয়েছে;চারটি তেলের এবং দু'টি প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য। যদিও সব কূপ থেকে এখনই বাণিজ্যিক উৎপাদন হচ্ছে না।

বাইগাছির মাটিতে আপাতত একটি পাম্পজ্যাকই নিয়মিত কাজ করছে। পাশে তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা। যাতায়াত করছেন ওএনজিসির কর্মী ও আধিকারিকেরা। বাইরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে সব দেখছেন স্থানীয় মানুষ।

একটি ট্যাঙ্কার তেল দিয়ে দেশের জ্বালানি-সমস্যা মিটবে না। অশোকনগর বম্বে হাইয়ের বিকল্পও হয়ে যায়নি। কিন্তু আট বছর ধরে আশা ও হতাশার মধ্যে দুলতে থাকা এই প্রকল্পে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়া নিঃসন্দেহে বড় পদক্ষেপ। মাটির প্রায় আড়াই কিলোমিটার নীচ থেকে উঠে আসা অপরিশোধিত তেল এখন অশোকনগরকে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

সেই স্বপ্ন কতটা বাস্তব হবে, তা নির্ভর করবে নতুন কূপে কী পরিমাণ মজুত পাওয়া যায়, উৎপাদন কত দিন স্থায়ী থাকে এবং স্থানীয় মানুষ তার সুফল কতটা পান;তার উপর।

বিজেপির পাখির চোখে পুরসভা

সুব্রত আচার্য

বিধানসভায় বিজেপি জিতেছে। নবান্নের ক্ষমতাও এখন তাদের হাতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন সম্পূর্ণ করতে হলে আরও একটি দরজা পেরোতে হবে।

সেই দরজার নাম; পুরসভা নির্বাচন।

বিধানসভা নির্বাচন ছিল সরকার বদলের ভোট। পুরসভা নির্বাচন হবে সেই বদলের প্রথম স্থানীয় পরীক্ষা। কারণ এখানে দিল্লি কিংবা নবান্নের বড় প্রতিশ্রুতির চেয়ে বাড়ির সামনের রাস্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পানীয় জল আসে কি না, অল্প বৃষ্টিতে পাড়া ডোবে কি না, আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার হয় কি না; ভোটের বাক্সে তারও হিসাব হয়।

তাই বিধানসভায় জয়ের ঢেউ পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে একইভাবে পৌঁছবে; এমনটা ধরে নেওয়া ভুল হবে।

বিজেপি সেই কঠিন পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা পুরসভার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস রায় ও রীতেশ তিওয়ারি। হাওড়ার দায়িত্ব পেয়েছেন বিজেপির আর এক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিংহ।



এত ওজনদার নেতাকে পুরভোটের দায়িত্ব দেওয়াই বুঝিয়ে দিচ্ছে, বিজেপি এই নির্বাচনকে শুধু কয়েকটি পুরবোর্ড দখলের লড়াই হিসেবে দেখছে না। দলটি প্রমাণ করতে চাইছে, বিধানসভায় পাওয়া জনসমর্থন শুধু তৃণমূলবিরোধী ক্ষোভের ফল ছিল না। সেই সমর্থনকে স্থানীয় প্রশাসনের স্তরেও ধরে রাখা সম্ভব।

কিন্তু কাজটি কি এত সহজ?

বদলে গিয়েছে কলকাতার অঙ্ক

২০২১ সালের কলকাতা পুরভোটে ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল জিতেছিল ১৩৪টিতে। বিজেপি তিনটি, বামফ্রন্ট দুটি, কংগ্রেস দুটি এবং নির্দল প্রার্থীরা তিনটি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছিলেন।

সেই পুরনো অঙ্ক এবার সরাসরি কাজে লাগবে না।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া সংশোধনী আইন অনুযায়ী কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ২০৯। ২০ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেজেটে আইনটি কার্যকর হওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। হাওড়া পুরসভার নির্বাচিত ওয়ার্ডের সংখ্যাও ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করার সংশোধনী পাশ হয়েছে।

সরকারের যুক্তি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নাগরিক পরিষেবার চাপ বেড়েছে। ওয়ার্ড ছোট হলে কাউন্সিলরের পক্ষে মানুষের কাছে পৌঁছনো এবং পরিষেবার উপর নজর রাখা সহজ হবে।

যুক্তিটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তিন পাতায়

অভাব আছে, থেমে নেই মায়ের মুখ গড়া

সম্পদ চক্রবর্তী



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও কুমোরটুলির শিল্পীদের হাতেই জীবন্ত হয়ে ওঠেন দেবী

সরু গলিতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে অসম্পূর্ণ প্রতিমা। কারও শরীরে এখনও খড় দেখা যাচ্ছে। কারও গায়ে পড়েছে মাটির প্রথম প্রলেপ। কোথাও শিল্পীর আঙুলের আলতো চাপে ফুটে উঠছে মায়ের মুখ। বাইরে থেকে ভেসে আসছে হাতুড়ির শব্দ। ভিজে মাটি, খড় আর রঙের গন্ধে বোঝা যাচ্ছে; কুমোরটুলিতে পুজো এসে গিয়েছে। অথচ এই ব্যস্ততার আড়ালেও রয়েছে অভাবের দীর্ঘ গল্প।

কুমোরটুলির ইতিহাস প্রায় তিন শতকের। অষ্টাদশ শতকে কলকাতার উত্তর প্রান্তে কুমোরদের বসতি থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এই শিল্পপাড়া। প্রথমে হাঁড়ি, কলসি ও নিত্যব্যবহারের মাটির সামগ্রী তৈরি করতেন শিল্পীরা। বনেদিবাড়ির দুর্গাপুজো বাড়তে থাকায় তাঁদের হাতেই শুরু হয় প্রতিমা নির্মাণ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খড় বাঁধা, মাটি দেওয়া, মুখ গড়া এবং চক্ষুদানের কৌশল পরিবারের মধ্যেই শেখানো হয়েছে। সময় বদলেছে। বনেদিবাড়ির পুজোর পাশে এসেছে বারোয়ারি উৎসব। সাবেক প্রতিমার পাশাপাশি এসেছে থিম। এখন কলকাতা ছাড়িয়ে কুমোরটুলির দুর্গা পাড়ি দেন আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড ও দুবাইয়ে। বিদেশে পাঠানোর সুবিধার জন্য তৈরি হচ্ছে হালকা ও টেকসই ফাইবারগ্লাসের প্রতিমাও। অনলাইনে ছবি দেখে অর্ডার দিচ্ছেন প্রবাসীরা। তবু শিল্পীদের লড়াই কমেনি। মাটি, খড়, বাঁশ, রং এবং সাজসজ্জার দাম বেড়েছে। এ বছর মাটির জোগান নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তার সঙ্গে রয়েছে বৃষ্টির ভয়, অল্প জায়গার কর্মশালা, দক্ষ সহকারীর অভাব এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিমা পৌঁছে দেওয়ার চাপ। পুজোর কয়েক মাস কাজের ব্যস্ততা থাকলেও অনেক শিল্পীর সারা বছরের আয় নিশ্চিত নয়। এর মধ্যেই এসে গিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ। কয়েক মুহূর্তে কম্পিউটার এখন দেবীর অসংখ্য কাল্পনিক রূপ তৈরি করতে পারে। পুজো কমিটিগুলি ডিজিটাল নকশা ও ত্রিমাত্রিক পরিকল্পনাও ব্যবহার করছে। কিন্তু পর্দায় তৈরি ছবি আর খড়-মাটির প্রতিমা এক নয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নকশার ধারণা দিতে পারে। রঙের মিল দেখাতে পারে। বিদেশি ক্রেতার কাছে শিল্পীর কাজ পৌঁছে দিতেও প্রযুক্তি সাহায্য করছে। কিন্তু মাটির আদ্রতা বুঝে আঙুলের চাপ বদলানো, মুখে স্নেহ ও শক্তির মিশ্র অভিব্যক্তি আনা কিংবা চক্ষুদানের মুহূর্তে দেবীকে জীবন্ত করে তোলার অনুভব; এখনও শিল্পীর নিজস্ব।

কুমোরটুলির ভবিষ্যৎ তাই প্রযুক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নয়; প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে। প্রয়োজন উন্নত কর্মশালা, সহজ ঋণ, কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন জোগান, রপ্তানির সহায়তা এবং নতুন প্রজন্মের প্রশিক্ষণ। কারণ দুর্গাপুজোর আলোয় আমরা মণ্ডপ দেখি, প্রতিমা দেখি। কিন্তু সেই আলো তৈরির পিছনে থাকা ক্লান্ত হাতগুলি প্রায়ই অন্ধকারে থেকে যায়। শত অভাবেও সেই হাত থামে না। প্রতি বছর মাটি ছুঁয়ে তারা যেন একই কথা বলে; মা আবার আসছেন।

নাগপুর জয় করে ফিরল মধ্যমগ্রামের 'র' বাহিনী

১১ জনের ঝুলিতে ১০টি সোনা, একটি রুপো; এবার লক্ষ্য রাশিয়া



নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ গলায় কারও সোনার পদক। কারও হাতে শংসাপত্র। মুখে লড়াই জয়ের হাসি। নাগপুর থেকে মধ্যমগ্রামে ফিরেছেন ১১ জন তরুণ-তরুণী। সঙ্গে ১০টি সোনা এবং একটি রুপোর পদক।

মধ্যমগ্রামের অ্যাকাডেমি অব মার্শাল আর্টস অ্যান্ড সেল্ফ ডিফেন্সেস কর্তৃপক্ষ এই পত্রিকাকে জানিয়েছে, ২২ থেকে ২৪ আগস্ট নাগপুরে আয়োজিত জাতীয় এমএমএ ১২.০ ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপে এই সাফল্য পেয়েছেন তাঁদের খেলোয়াড়েরা।

এমএমএ অর্থাৎ মিক্সড মার্শাল আর্ট। এখানে শুধু শরীরের শক্তি থাকলেই হয় না। প্রয়োজন ক্ষিপ্রতা, কৌশল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রাখার ক্ষমতা। নাগপুরের ওই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫ থেকে ১৬টি দল অংশ নিয়েছিল বলে দাবি মধ্যমগ্রামের প্রতিষ্ঠানটির।

বাংলা থেকে একমাত্র তাদের প্রতিষ্ঠানই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল বলে জানিয়েছেন অ্যাকাডেমির কর্মকর্তারা। যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন ১১ জন পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়। এই অ্যাকাডেমিরই একটি দল র‍্যান্ডম অ্যাকশন ওয়ারিয়র্স, সংক্ষেপে 'র'।

সংশ্লিষ্টদের দাবি, নাগপুর, মহারাষ্ট্রের অন্য অংশ, তামিলনাড়ু ও রায়পুর-সহ বিভিন্ন এলাকার প্রতিযোগীদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল মধ্যমগ্রামের খেলোয়াড়দের। একের পর এক লড়াই পেরিয়ে দলের ১০ জন সোনা জেতেন। অন্য প্রতিযোগী পান রুপো। অর্থাৎ নাগপুরে যাওয়া ১১ জনই পদক নিয়ে বাংলায় ফিরেছেন।

খেলোয়াড়দের সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রশিক্ষক অনিমেষ বিশ্বাস। তবে এই জয়েই থেমে থাকতে রাজি নন তিনি। তাঁর চোখ এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে। প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানানো হয়েছে, আয়োজক সংস্থা হেডিসের উদ্যোগে রাশিয়ায় পরবর্তী প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে ভারতের হয়ে অংশ নিতে চায় মধ্যমগ্রামের এই দল।

কিন্তু ইচ্ছা আর বাস্তবের মধ্যে রয়েছে অর্থের বড়

তিন পাতায়

Printed by Zafrin Chowdhury Published by SUBRATA ACHARYA on behalf of SUBRATA ACHARYA Printed at BANGLA DIGITAL PRINTER, 77 Nirghin Shah Road, South Kazipara, Barasat, North 24 PARGANAS, 700125, West Bengal and Published at 61, BODHIKANAN BHUTBAGAN (KATHGOLA), P.O.: SODEPUR, P.S.: GHOLA, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 700110.
Editor : **SUBRATA ACHARYA** Mobile: **+91 9830317116** Email : mailprothomkolkata@gmail.com